বাংলাদেশের রাজনীতি
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নজরুল ইসলাম

প্রকাশন

বাংলাদেশের রাজনীতি : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
নজরুল ইসলাম, পিএইচডি
প্রচ্ছদ: শৈলী বিভাগ, দ্যু প্রকাশন

প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
প্রথম দ্যু প্রকাশ: ফাল্গুন ১৪৩১, মার্চ ২০২৫

Bangladesher Rajniti : Sangkshipta Parichiti
[THE POLITICS OF BANGLADESH : A BRIEF HISTORY]
by Nazrul Islam, PhD
Cover Designed by DyuARTS
First Published: March 2025 by Dyu Publication

www.dyu.com.bd
ISBN: 978-984-99992-5-6
Printed & Bound in Bangladesh

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form, or any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the author and publisher, except where permitted by law.

উৎসর্গ

বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী
ড. রওনক জাহানকে

চিত্র ও সারণি সূচি

চিত্র

চিত্র ৭.১ বাংলাদেশের প্রবাসী কর্মীর সংখ্যা (১৯৭৬-২০২২) ৮৮
চিত্র ৭.২ বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের পরিমাণ (১৯৭৬-২০২২) ৮৮
চিত্র ৭.৩ বাংলাদেশের প্রবাসী কর্মীদের নিয়োজনে বিভিন্ন দেশের অংশ (%) ৮৯
চিত্র ৮.১ বিগত সময়কালে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি ৯৪

সারণি

সারণি ১.১ প্রথম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৭৩ ২৪
সারণি ১.২ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৭০ ৩০
সারণি ২.১ দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৭৯ ৫১
সারণি ৩.১ তৃতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৮৬ ৬০
সারণি ৩.২ চতুর্থ সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৮৮ ৬১
সারণি ৪.১ পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৯১ ৬৪
সারণি ৪.২ ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৯৬ ফেব্রুয়ারি ৬৬
সারণি ৪.৩ সপ্তম সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৯৬ জুন ৬৭
সারণি ৪.৪ অষ্টম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ২০০১ ৬৮
সারণি ৫.১ নবম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ২০০৮ ৭৬
সারণি ১০.১ দশম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ২০১৪ ১০৭
সারণি ১১.১ একাদশ নির্বাচনের ফলাফল, ২০১৮ ১১৮
সারণি ১২.১ পৌরসভা নির্বাচনের ফলাফল, ২০২০-২০২১ ১৩২
সারণি ১২.২ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল, ২০২০-২০২১ ১৩৬
সারণি ১২.৩ বিভিন্ন সংসদ আসনে উপ-নির্বাচনের ফলাফল, ২০২২-২০২৩ ১৪৬
সারণি ১২.৪ বিভিন্ন নগর কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল, ২০২৩ ১৪৮
সারণি ১২.৫ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ২০২৪ ১৬৪
সারণি ১৩.১ উপজেলা নির্বাচনের ফলাফল, ২০২৪ ১৭২

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১১

ভূমিকা ১৫

পরিচ্ছেদ ১: বঙ্গবন্ধুর আমল—দেশ গঠনের সূচনা (১৯৭২-৭৫) ২১
১.১ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ ২১
১.২ বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সাফল্য ও সংকট ২২
১.৩ বঙ্গবন্ধুর তিন চ্যালেঞ্জ ২৭
১.৪ বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ৩৫

পরিচ্ছেদ ২: জিয়ার অধীনে মৌলিক পরিবর্তন (১৯৭৫-১৯৮১) ৩৯
২.১ জিয়ার ক্ষমতায় আরোহণ ৩৯
২.২ জিয়ার ক্ষমতা সংহতকরণ ৪৫
২.৩ জিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ৪৭
২.৪ জিয়া আমলের অবসান ৫২

পরিচ্ছেদ ৩: এরশাদের শাসনামল: জিয়ার নীতির ধারাবাহিকতা (১৯৮২-১৯৯০) ৫৫
৩.১ জিয়া-প্রবর্তিত ধারাকে পরিণতি প্রদান ৫৫
৩.২ ক্ষমতা সংহতকরণে এরশাদের বিভিন্ন প্রয়াস ৫৭

পরিচ্ছেদ ৪: গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনসমূহ ৬৩
৪.১ পঞ্চম সংসদ নির্বাচন ও বিএনপির সরকার গঠন, ১৯৯১ ৬৩
৪.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন ৬৫
৪.৩ সপ্তম সংসদ নির্বাচন ও আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ৬৬
৪.৪ অষ্টম সংসদ নির্বাচন ও বিএনপির ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ৬৮
৪.৫ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ৬৯
৪.৬ জঙ্গিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ৭০
৪.৭ শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা ৭০
৪.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অপব্যবহারের প্রয়াস ৭২

পরিচ্ছেদ ৫: আধা-সামরিক শাসনের আরেক পর্ব: ১/১১ সরকার (২০০৭-২০০৮) ৭৩
৫.১ ১/১১ সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়াস ও ফলাফল ৭৩

৫.২ ১/১১ সরকার কর্তৃক দুর্নীতি দমনের প্রয়াস ও ফলাফল ৭৪
৫.৩ ১/১১ সরকার কর্তৃক নবম সংসদ নির্বাচনের আয়োজন ৭৫

পরিচ্ছেদ ৬: যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ৭৭
৬.১ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সূচনা ৭৭
৬.২ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্দোলন ৭৮
৬.৩ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং 'গণজাগরণ মঞ্চ' ৮১

পরিচ্ছেদ ৭: বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের দ্বৈততা ও রাজনীতিতে তার প্রভাব ৮৪
৭.১ আত্মপরিচয়ের মুসলমান দিক ও পাকিস্তান আন্দোলন ৮৪
৭.২ আত্মপরিচয়ের বাঙালি দিক ও স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন ৮৬
৭.৩ আত্মপরিচয়ের মুসলমান দিকের পুনরুত্থান ও নতুন মাত্রা অর্জন ৮৭

পরিচ্ছেদ ৮: মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার এবং হেফাজতে ইসলামের উত্থান ৯২
৮.১ আলিয়া মাদ্রাসা ৯২
৮.২ কওমি মাদ্রাসার বিপুল বৃদ্ধি ৯৩
৮.৩ কওমি মাদ্রাসা ও হেফাজতে ইসলাম ৯৬
৮.৪ রাজনীতিতে হেফাজতে ইসলামের প্রবেশ ৯৬

পরিচ্ছেদ ৯: বাংলাদেশের সংবিধান সংক্রান্ত উচ্চ এবং সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায়সমূহ ৯৯
৯.১ পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল ৯৯
৯.২ পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিলে রাজনৈতিক দলসমূহের গৌণ ভূমিকা ১০০
৯.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল ১০২

পরিচ্ছেদ ১০: দশম সংসদ নির্বাচন (২০১৪) ১০৩
১০.১ বিরোধীদলসমূহ কর্তৃক দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি ১০৩
১০.২ দশম নির্বাচনের ফলাফল ১০৬

পরিচ্ছেদ ১১: একাদশ সংসদের নির্বাচন (২০১৮) ১০৮
১১.১ মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের অসাফল্য ১০৯
১১.২ জামায়াত ও হেফাজতের বিভিন্ন সমস্যা ১১০
১১.৩ গণজাগরণ মঞ্চের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ১১২
১১.৪ কোটা আন্দোলন ও ডাকসু নির্বাচন ১১৩
১১.৫ একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ১১৫
১১.৬ একাদশ সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ১১৭
১১.৭ বর্ষীয়ানদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ১২১

পরিচ্ছেদ ১২: দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন (২০২৪) ১২২
১২.১ 'রাজনীতিহীন বছর', ২০১৯ ১২২

১২.১.১ একাদশ সংসদ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন
১২.১.২ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রশ্নে বিএনপির সংকট
১২.১.৩ রাজপথের দুর্বল আন্দোলন
১২.১.৪ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের বিভিন্ন অনাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
১২.১.৫ সড়ক অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন
১২.১.৬ একেবারে রাজনীতিবিহীন বছর নয়
১২.২ বহুলাংশে অপরিবর্তিত রাজনীতি, ২০২০ ১২৬
১২.২.১ বিভিন্ন উপ-নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ
১২.২.২ ঢাকা নগর কর্পোরেশন নির্বাচন
১২.২.৩ জামায়াতের সংকট
১২.২.৪ হেফাজতের সংকট
১২.২.৫ কোভিড ১৯
১২.২.৬ পৌরসভা নির্বাচন শুরু
১২.২.৭ বহুলাংশে অপরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি
১২.৩ দ্বাদশ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের রাজনীতি, ২০২১ ১৩২
১২.৩.১ পৌরসভা নির্বাচন
১২.৩.২ চট্টগ্রাম নগর কর্পোরেশন নির্বাচন
১২.৩.৩ রাজনীতিতে হেফাজতের পুনঃপ্রবেশের প্রয়াস ও পরিণতি
১২.৩.৪ তিন সংসদ আসনে উপ-নির্বাচন
১২.৩.৫ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন
১২.৩.৬ ২০২১ সালের রাজনীতির দুই মূল বৈশিষ্ট্য
১২.৪ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, ২০২২-২০২৩ ১৩৭
১২.৪.১ নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা নগর কর্পোরেশনের নির্বাচন
১২.৪.২ জেলা পরিষদ নির্বাচন
১২.৪.৩ নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন
১২.৪.৪ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে বিএনপির কৌশল ও কার্যক্রম
১২.৪.৫ বিএনপির বিভিন্ন মিত্র এবং 'রাষ্ট্র মেরামত কর্মসূচি'
১২.৪.৬ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের কৌশল ও কার্যক্রম
১২.৪.৭. বিএনপি সদস্যদের পদত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্য সংসদ আসনে উপনির্বাচন
১২.৪.৮ পাঁচ নগর কর্পোরেশন নির্বাচন
১২.৫ দ্বাদশ সংসদের নির্বাচন, ২০২৩-২০২৪ ১৪৮
১২.৫.১ একদফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিএনপির আন্দোলন
১২.৫.২ বিএনপির এক দফা আন্দোলন প্রতিহতকরণে আওয়ামী লীগের তৎপরতা
১২.৫.৩ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার
১২.৫.৪ ভোট হারের ওপর গুরুত্ব আরোপ
১২.৫.৫ স্বতন্ত্র প্রার্থী কৌশল
১২.৫.৬ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ওপর বিদেশি প্রভাব
১২.৫.৭ ২৮ অক্টোবরের শো-ডাউন ও পরিণতি
১২.৫.৮ ৭ জানুয়ারির নির্বাচন
১২.৫.৯ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ফলাফল
১২.৫.১০ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন: সামগ্রিক মূল্যায়ন

পরিচ্ছেদ ১৩: কোটা আন্দোলন ও ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান ১৭০
১৩.১ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলি ১৭০
১৩.২ কোটা আন্দোলনের পটভূমি ১৭৩
১৩.২.১ কোটা সমস্যার স্বরূপ
১৩.২.২ শিক্ষিত বেকারের সমস্যা
১৩.২.২ সরকারি চাকরির অতিরিক্ত আকর্ষণ
১৩.২.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসসমূহে ছাত্রলীগের অত্যাচার-অনাচার
১৩.২.৪ দুর্নীতি-নির্ভর একনায়কতান্ত্রিক শাসন
১৩.২.৫ কোটা সম্পর্কে আদালতের ইতিপূর্বের রায়সমূহ
১৩.৩ কোটা সংস্কার আন্দোলন, ২০১৮ ১৮৮
১৩.৪ কোটা সংস্কার বা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন, ২০২৪ ১৯১
১৩.৪.১ নতুন পর্যায়ে কোটা আন্দোলনের সূচনা
১৩.৪.২ শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলন
১৩.৪.৩ আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি
১৩.৪.৪ ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের রায়
১৩.৪.৫ আন্দোলনের নতুন পর্যায়
১৩.৪.৬ আন্দোলন দমনে বলপ্রয়োগে সেনাবাহিনীর অস্বীকৃতি
১৩.৪.৭ শেখ হাসিনা সরকারের পতন

পরিশিষ্ট
১. বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ ২১৩
২. ২১ জুলাই ২০২৪ শিক্ষার্থী আন্দোলনে ঘোষিত ৯ দফা ২১৭

নির্দেশিত রচনাবলী ২১৮

নির্ঘণ্ট ২২২

মুখবন্ধ

এই বইটির সূত্রপাত ঘটে আমার লেখা ২০১৬ সালে নিউ ইয়র্কস্থ পলগ্রেভ-ম্যাকমিলান কোম্পানি কর্তৃক *গভর্নেন্স ফর ডেভেলপমেন্ট—পলিটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস ইন বাংলাদেশ* শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে। সেই গ্রন্থে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যাগুলোর উৎপত্তি ব্যাখ্যার জন্য বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস বিষয়ক একটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত হয়েছিল। বর্তমান বইটি সেই পরিচ্ছদের একটি হালনাগাদকৃত এবং সম্প্রসারিত রূপ। এই হালনাগাদ করতে যেয়ে ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচন থেকে ২০২৪ সালের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন এবং অবশেষে একই বছরের জুলাই গণঅভ্যুত্থান এবং ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ এবং ব্যাখ্যা করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। সে কারণে এই অংশটি বইয়ের আগের অংশের চেয়ে বেশি বিস্তারিত হয়েছে। যারা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষ আগ্রহী তাদের জন্য এটা উপকারী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

নির্মোহ ইতিহাস লেখা একটি কঠিন কাজ। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই বইয়ে আমি যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছি। সেই লক্ষ্যে পাদটীকা কিংবা পরিশিষ্টে সংশ্লিষ্ট অনেক দলিল ও তথ্য সংযুক্ত করেছি। এর ফলে উৎসাহীরা এই গ্রন্থে আকরের সন্ধান পাবেন এবং সেগুলো পড়ে নিজেরাই বইয়ে প্রদত্ত বিবরণ কিংবা অভিমতের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করতে পারবেন। সেজন্য এই বইয়ের মূল অংশের চেয়ে পাদটীকাসমূহ কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এগুলোর আকারও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ হয়েছে। আশা করি এসব পাদটীকা ও পরিশিষ্ট পাঠককে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস গভীরভাবে জানা ও অনুধাবনে সহায়তা করবে। তবে আমি সচেতন যে, যতই বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, এই গ্রন্থে বিধৃত ইতিহাসের বিভিন্ন প্রশ্নে অনেকে দ্বিমত পোষণ করবেন। এটা অপ্রত্যাশিত

নয়, কারণ মতের ভিন্নতা হতেই পারে। কিন্তু এই গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি থাকে তা ধরিয়ে দিলে আমি বাধিত হব।

উপরে উল্লেখ করেছি, ২০১৬ সালের গ্রন্থের যে পরিচ্ছেদের ভিত্তিতে এই বইটি রচিত তা লেখা হয়েছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের আলোচনার তথ্যগত পটভূমি সৃষ্টির জন্য। এসব সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি অনেক আগেই সোচ্চার হয়েছিলাম। বস্তুত, ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া আমাকে পীড়া দেয়। তা সত্ত্বেও দেশে যাতে এসব সংস্কারের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্যে আমি কলম ধরেছিলাম। সেই সূত্রে নব্বই দশকে ও নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকে আমি বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখি এবং তাতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরি। এসব প্রস্তাবকে সমন্বিত রূপ এবং তথ্যগত ও তত্ত্বগত ভিত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যেই ২০১৬ সালের বইটি লিখি। এটা আনন্দের যে, পরবর্তীকালে সংস্কারের চিন্তাটি সমাজে প্রসারিত হয় এবং রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলন নামে একটি আন্দোলন ও সংগঠনও গড়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও রাষ্ট্রসংস্কারের কিছু কিছু বিষয় তাদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের একটি মূল কাজ হয় রাষ্ট্রসংস্কারের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার বহু কমিশন গঠন করে এবং এসব কমিশন তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছে। সন্তোষের বিষয়, এসব কমিশনের সুপারিশমালায় রাজনীতি ও প্রশাসনের যেসব সংস্কারের কথা আমি নব্বই দশক থেকে বলে আসছিলাম তার কিছু পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে। যেমন: সংবিধান ও নির্বাচন সংস্কার কমিশন সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে চার বছর করা এবং আংশিকভাবে আনুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। তবে শেষোক্ত সুপারিশ কিছু দুশ্চিন্তারও উদ্রেক করেছে, কারণ আনুপাতিক নির্বাচনের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে তা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট রূপের ওপর। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই কমিশনের প্রস্তাবের ফলে হিতে-বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কারণ তারা আনুপাতিক নির্বাচনের প্রস্তাব করেছে একটি অপ্রয়োজনীয়, আলঙ্কারিক ও অপচয়মূলক উচ্চকক্ষের জন্য, মূল সংসদের জন্য নয়।[১]

১. এ বিষয়ে আলোচনার জন্য উৎসাহীরা দেখতে পারেন আমার বই, *আনুপাতিক নির্বাচন—কী এবং কেন* (বাংলা ধরিত্রী, ২০২৪)।

যাহোক, এখন কোন সংস্কার কখন ও কীভাবে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানোর প্রয়াস চলছে। এই প্রয়াস কতটা সফল হবে তা বলা কঠিন। কারণ—প্রথমত, গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থানের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সংসদের অনুপস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকার কতটা সংস্কার সাধনের এখতিয়ার রাখে সে বিষয়ে মতৈক্য নেই। তৃতীয়ত, দেশের স্থিতিশীলতার স্বার্থে দ্রুত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও সংস্কার যে জাতীয় আলোচ্যে পরিণত হয়েছে সেটি একটি অগ্রগতি এবং অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কার যে, সংস্কারের বিতর্ক ও আলোচনা আগামী সংসদ নির্বাচন ও রাজনৈতিক সরকার গঠনের পরও অব্যাহত থাকবে। সে কারণে সংস্কারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যার জন্য দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিবরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েই গেছে। আশা করা যায় যে, এই বইটি সে প্রয়োজন মেটাতে সহায়ক হবে।[২]

লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বহু বই প্রকাশিত হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব কিংবা কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ভূমিকার ওপর নিবদ্ধ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের গোটা সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার তেমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানার একটি সাধারণ প্রয়োজন মেটাতেও এই বই সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

এই বইয়ে বিধৃত ইতিহাস শেষ হয়েছে ২০২৪ সালে ৫ আগস্ট, যেদিন শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। তারপর শুরু হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়, যা নিয়ে নতুন ও ভিন্ন কোনো গ্রন্থ রচিত হতে হবে। এই বইয়ে তাতে হেলাভরে প্রবেশ উপযুক্ত হতো না। সেজন্য জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে পরে যেসব পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে তা এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা না করে বরং সমসাময়িক পত্রিকায় যেসব পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয় তাতেই সীমাবদ্ধ থাকা হয়েছে, কারণ

২. এই গ্রন্থে পরিবেশিত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য যেসব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে আমি অন্য কয়েকটি গ্রন্থে আলোচনা করেছি। উৎসাহীরা দেখতে পারেন *উন্নয়নের জন্য সুশাসন—বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০২৫) এবং *স্বৈরতন্ত্র প্রতিরোধের পথ—রাষ্ট্রসংস্কার ও সংবিধান সংশোধন* (প্রথমা প্রকাশন, ২০২৪)।

এসব পরিসংখ্যানের মূল উদ্দেশ্য হলো কীভাবে ও কোন কোন তারিখের ঘটনাবলি দ্বারা আন্দোলন গতিবেগ অর্জন করে সেই প্রক্রিয়াটি তুলে ধরা, এসব পরিসংখ্যানের সঠিকতা দাবি করা নয়।

এই বই লেখা ও প্রকাশের জন্য অনেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শওকত হোসেন যিনি উপর্যুক্ত ২০১৬ সালের বইয়ের রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ক পরিচ্ছেদের প্রাথমিক অনুবাদ করেছিলেন। তবে আগেই উল্লেখ করেছি, হালনাগাদ এবং পৃথক বই আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে এই গ্রন্থটি বহুলাংশে নতুন করে লিখতে হয়েছে। এই পুনর্লিখন প্রক্রিয়ায় শওকত হোসেনের অনুবাদ অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে এবং সেজন্য তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশে উৎসাহিত হওয়ার জন্য দ্যু প্রকাশনকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। পাণ্ডুলিপির বিষয়ে তাদের কিছু মতামত এই বইয়ের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেছে। বইটি প্রকাশের বিষয়ে আগ্রহী হওয়া এবং বিভিন্নরূপী সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আহমাদ মাযহারকে বিশেষ ধন্যবাদ। আমার লেখালেখির প্রতি উৎসাহ ও মনোযোগ প্রদানের জন্য বন্ধুবর অধ্যাপক এম এম আকাশ ও সমাজ গবেষণা কেন্দ্রের অন্যান্য বন্ধুদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহান তাঁর পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভের ভিত্তিতে প্রকাশিত গ্রন্থ *পাকিস্তান—ফেইলিয়র ইন ন্যাশনাল ইন্টেগ্রেশন* থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধের মাধ্যমে এদেশের রাজনীতির বিশ্লেষণে অনন্য অবদান রেখেছেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী না হয়েও রাজনীতি বিষয়ে হয়তোবা আমার অনধিকার চর্চাকে উৎসাহিত করেছেন। এই বইটি তাঁকে উৎসর্গ করার মাধ্যমে তাঁর অবদানের প্রতি আমার সম্মান প্রকাশের চেষ্টা করলাম।

সবশেষে, আমি কৃতজ্ঞ আমার নিকট ও সম্প্রসারিত পরিবারের সদস্যদের প্রতি যাঁদের নিরন্তর ভালবাসা ও সহযোগিতা আমার জীবনের বড় পাথেয়।

নজরুল ইসলাম
মার্চ ২০২৫

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনীতির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যে গ্রন্থটির আলোচনা মূলত ঘটনাক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। তবে ঘটনাক্রম বোঝার সুবিধার্থে পটভূমিগত আলোচনাসংবলিত কিছু পরিচ্ছেদও যথাস্থানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে যথাক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২-১৯৭৫), জেনারেল জিয়া (১৯৭৫-১৯৮১) ও জেনারেল এরশাদ (১৯৮২-১৯৯০)-এর আমলের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন হলে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রথম একটি এড-হক ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়, যার দায়িত্ব ছিল একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত সরকারের নিকট ক্ষমতার হস্তান্তর। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চম সংসদ গঠিত হয় এবং তাতে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ও সরকার গঠন করে। ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ী আইনি রূপলাভ করে এবং ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সপ্তম ও অষ্টম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে গঠিত সরকারসমূহের আমলের রাজনৈতিক ঘটনাবলির আলোচনা করা হয়েছে।

২০০৬ সালে পরবর্তী নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রশ্নে দেশে এক সংকটের সৃষ্টি হয়। এই সংকটের ফলে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সামরিক বাহিনী সমর্থিত একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সাধারণভাবে ১/১১ সরকার বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এই সরকার ত্রয়োদশ সংশোধনী দ্বারা নির্ধারিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের করণীয় ও মেয়াদকালের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক সংস্কার এবং দুর্নীতি দূরীকরণের কর্মসূচি হাতে নেয়। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। ফলে সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের

দায়িত্বের ওপর মনোনিবেশ করে এবং ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নবম সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে এবং দেশ পুনরায় বেসামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তন করে।

পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলি বোঝার জন্য কিছু পটভূমিগত আলোচনার প্রয়োজন। সেজন্য সময়ক্রমানুবর্তিতা থেকে সরে গিয়ে কয়েকটি পরিচ্ছেদে কিছু বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটি হলো যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখবো যে, বঙ্গবন্ধুর আমলে এই বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হলেও বিভিন্ন কারণে তা অসমাপ্ত থেকে যায়। সে কারণে নব্বইয়ের দশকে এই বিচারের দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তা 'গণজাগরণ মঞ্চে'র রূপ গ্রহণ করে এবং দেশের রাজনীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের দ্বৈততা। এটি একটি বৃহত্তর বিষয় এবং তা বাংলাদেশের রাজনীতির একটি মৌল প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নৃতত্ত্ব, ভাষা, এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালি; অন্যদিকে, ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা মুসলমান। ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলার মুসলমানেরা ব্রিটিশ শাসক এবং হিন্দু জমিদারদের দ্বারা শোষিত এবং নিপীড়িত হওয়ার কারণে নিজেদের মুসলমান পরিচয়ের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা ঔপনিবেশিক ধরনের শোষণ এবং শাসনের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা নিজেদের বাঙালি পরিচয়ের ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসন এবং শেষে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাঙালি পরিচয়ের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় এবং তা তাদের আত্মপরিচয়ের মুসলমান-দিকের পুনরুত্থানের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। মধ্যপ্রাচ্যের ওয়াহাবী ইসলামের অনুসারী দেশসমূহের অর্থবিত্তের বিপুল বৃদ্ধি এই প্রক্রিয়ার সহায়ক হয়। সপ্তম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের রাজনীতির এই বৃহত্তর প্রেক্ষিতের বিবর্তনের আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় বিষয় হলো, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, বিশেষত কওমি মাদ্রাসার সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি। এটা ছিল বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের মুসলমান-দিকের উপরিল্লিখিত পুনরুত্থানের সহগামী আরেকটি প্রক্রিয়া। সময়ে এসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের ভিত্তিতে 'হেফাজতে ইসলাম' নামক সংগঠন গড়ে ওঠে। অরাজনৈতিক

হওয়ার কথা থাকলেও হেফাজতে ইসলাম এক পর্যায়ে রাজনৈতিক ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং এখনও একটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রভাবক হিসেবে বিরাজ করছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের রাজনীতির এই উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ বিষয় হলো, উচ্চ ও সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের সংবিধান সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায়। তারমধ্যে প্রথমটি হলো ২০০৫ সালে হাইকোর্ট এবং পরে ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক জিয়াউর রহমান দ্বারা আনীত ১৯৭৫-১৯৭৯ সময়কালীন সামরিক আইনকে বৈধতা দানকারী সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল ঘোষণা। দ্বিতীয় হলো, ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক আনীত ১৯৮২-১৯৮৬ সময়কালের সামরিক আইনকে বৈধতা দানকারী সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বাতিল ঘোষণা। তৃতীয় হলো, ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনী দ্বারা প্রবর্তিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিবেচনা করে তা বাতিল ঘোষণা। এসব রায়ের প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হয়, যা বাংলাদেশের সংবিধানের ওপর পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনীর প্রভাব বহুলাংশে দূর করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থারও অবসান ঘটায়। নবম পরিচ্ছেদে এসব রায় এবং বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী উপর্যুক্ত চারটি বিষয়ের আলোচনার পর এই গ্রন্থের আলোচনা রাজনৈতিক ইতিহাসের সময়ানুক্রমিক বিবরণে ফিরে আসে। নবম সংসদ দ্বারা গঠিত সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে বিরোধীদলসমূহ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করে তার অধীনে দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানায়। কিন্তু সরকার সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে, যার ফলে এক তুমুল সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারী বিরোধী দলসমূহ অবশেষে নির্বাচন বর্জন করে, এবং তার ফলে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত দশম সংসদে মূল বিরোধী দলসমূহের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকে না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পুনরায় সরকার গঠিত হয় এবং জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দল বলে গণ্য করা হয়। দশম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের রাজনীতির এই পর্বের আলোচনা করা হয়েছে।

দশম সংসদ সঠিকভাবে গঠিত হয়নি দাবি করে বিরোধী দলসমূহ মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি তুলে এবং তা আদায়ের জন্য হরতাল এবং অবরোধের কর্মসূচি সহকারে এক 'লাগাতার' আন্দোলনের সূচনা করে। কিন্তু এই আন্দোলন সফল না হওয়ায় বিরোধী দলসমূহ একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের তাগিদ অনুভব করে এবং সে উদ্দেশ্যে গণফোরামের নেতা ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে। কিন্তু যে ধরণের প্রত্যাশা নিয়ে বিএনপি ও তার মিত্ররা ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একাদশ সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তা পূরণ হয় না। সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, প্রশাসনের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার এই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয় এবং বিএনপি মাত্র ৭টি আসন লাভ করে। অপ্রত্যাশিত এই ফলাফলে বিএনপি ক্ষুব্ধ হয় এবং অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগের ভিত্তিতে সংসদে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে পরবর্তী সময়ে বিএনপি মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম ছাড়া বাকিরা সংসদে যোগ দেন। একাদশ পরিচ্ছেদে ২০১৪-২০১৮ সময়কালের রাজনীতির আলোচনা করা হয়েছে।

একাদশ সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিএনপি ও তার মিত্ররা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিদ্যমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ অর্থহীন এবং তাঁরা পুনরায় তত্ত্বাবধায়ক (সাধারণভাবে, একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয়) সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি তোলে। সরকার এই দাবি মেনে না নিলে বিএনপি ও তার মিত্রদলসমূহ দ্বাদশ সংসদের নির্বাচন বর্জন করে, যার ফলে অনেকটা দশম সংসদ নির্বাচনের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মূল বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় মনোনয়ন লাভকারী (তথা নৌকা প্রতীকধারী) প্রার্থীদের পাশাপাশি স্বীয় দলের সদস্যদের 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী হিসেবে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি প্রদান করে। বিরোধী দলসমূহ এসব প্রার্থীকে 'ডামি' প্রার্থী বলে অভিহিত করে। এর ফলে নির্বাচনে কিছুটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, তবে সামগ্রিকভাবে নির্বাচনে ভোটের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। পুনরায় একটি একপেশে সংসদ গঠিত হয় এবং নির্বাচনব্যবস্থাসংক্রান্ত অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ২০১৮-২০২৪ সময়কালের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখন মনে হচ্ছিল যে, প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে আওয়ামী লীগ সরকার আরেকটি মেয়াদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে,

প্রায় ঠিক সেসময়ই বাংলাদেশে আরেকটি গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এর সূচনা হয় সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর যখন বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসনের গোড়াপত্তন করা হয় তখন এর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে—অর্থাৎ কর্মকর্তা (অফিসার) পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ শতাংশ পদ বিভিন্ন কোটার অধীন করা হয়। সময়ে এসব কোটার পরিধি কমানো ও পরিবর্তিত করা হয়। তবে ২০১৮ সালেও প্রায় ৫৬ শতাংশ পদ বিভিন্ন কোটার অধীনে ছিল, যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা অথবা তাদের বংশধরদের জন্য ৩০ শতাংশ, নারীদের জন্য ১০ শতাংশ, বিভিন্ন অনগ্রসর জেলার জন্য ১০ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ৫ শতাংশ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ কোটা ছিল। কোটা বিরোধী আন্দোলনকারীরা সামগ্রিকভাবে অর্ধেকের বেশি চাকরি কোটার অধীন রাখাকে সংবিধান প্রদত্ত 'সবার জন্য সমান সুযোগে'র অধিকার বিরোধী মনে করে। বিশেষত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটাকে তাঁরা অন্যায্য মনে করে, কারণ মুক্তিযোদ্ধারা মোট জনসংখ্যার স্বল্প অংশ ছিলেন এবং তাদের নিজেদের ও সন্তানদের পর এখন তাঁদের নাতি-পুতিদের জন্য এত বিরাট পরিমাণ কোটা বজায় রাখার পেছনে সঙ্গত যুক্তি নেই।

সূচনাতে এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু শাসক দলের পক্ষ থেকে গঠনমূলক সমঝোতার পরিবর্তে আন্দোলনের বিরুদ্ধে হুমকি এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করার ইঙ্গিত দেওয়া হতে থাকে। শেখ হাসিনা প্রথমে নীরব থাকেন এবং পরে চীন সফর শেষে দেশে ফিরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন এবং প্রকারান্তরে আন্দোলনকারীদের 'রাজাকারের নাতিপুতি' বলে অভিহিত করেন। তাঁর বক্তব্য দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ছাত্রলীগ ও পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করা শুরু করে। সরকারের এ ধরণের বক্তব্য এবং ছাত্রলীগ ও পুলিশ দিয়ে আক্রমণ আন্দোলনকারীদের বিক্ষুব্ধ করে। বিশেষত, দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও হলসমূহে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপর ছাত্রলীগের নির্যাতনের কারণে যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়েছিল তার বিস্ফোরণ ঘটে। সারা দেশে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পড়ে এবং বেগবান হয়। তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রলীগকে বহিষ্কার করে; এবং সারা দেশে 'সর্বাত্মক হরতাল' (কমপ্লিট শাটডাউন) আহ্বান করে। সরকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে এবং শিক্ষার্থীদের হলত্যাগে বাধ্য করে। পুলিশ, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সরকার সমর্থকদের

গুলিতে সারা দেশে বহু ব্যক্তি নিহত ও অসংখ্য আহত হন। বিশেষত ১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের সাহসী মৃত্যুবরণ সারা দেশের ব্যাপক জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণে আরও উদ্বুদ্ধ করে। আন্দোলন কেবল কোটাব্যবস্থার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে দীর্ঘ পনের বছরব্যাপী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের ব্যাপক দুর্নীতি, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে অপারগতা, নিপীড়ন ও অন্যান্য আনাচারের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী শিক্ষার্থীরাও দূরদৃষ্টিতা এবং আন্দোলন সংক্রান্ত পরিকৌশল-স্বজ্ঞার পরিচয় দিয়ে আন্দোলনের নাম 'কোটা বিরোধী' থেকে প্রথমে 'কোটা-বৈষম্য বিরোধী' এবং পরে শুধুই 'বৈষম্য-বিরোধী'তে পরিবর্তিত করে। নামের এই পরিবর্তনের ফলে জনগণের ব্যাপক অংশ এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারে এবং তাতে অংশগ্রহণে এগিয়ে আসে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শিক্ষার্থী-জনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকার কোটা বিষয়ে আদালতের শুনানি এগিয়ে আনে এবং অবশেষে ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ের মাধ্যমে কোটা ৫৬ থেকে ৭ শতাংশে হ্রাস করে, যার মধ্যে ৫ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য, ১ শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য, এবং ১ শতাংশ প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু ততদিনে অসংখ্য মৃত্যু আন্দোলনকারী এবং সরকারের মধ্যে এক অন্যরকম ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, যার ফলে শিক্ষার্থীদের দাবি কোটা সংস্কারের পরিবর্তে সরকারের পতনের দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ক্ষমা চাওয়া এবং সবশেষে তাঁর পদত্যাগের একদফা দাবিতে রূপান্তরিত হয়। পুলিশ চৌকি ও বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন দেওয়া হয়। কিছু স্থানে পুলিশ ও সরকার সমর্থকেরাও নিহত হন।

২২ জুলাই থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। কিন্তু সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে এবং আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণে উৎসাহী হয় না। ফলে সরকারের পক্ষে পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো পথে খোলা থাকে না। ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে জুলাই-আগস্টের এই গণ-অভ্যুত্থান, তার কারণ, গতি-প্রকৃতি ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এখানেই এই গ্রন্থের ইতি টানা হয়েছে।